Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 342
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 331 - 342
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে জন্মগত হিজড়ে : চিরাচরিত সংস্কারের মূল্যায়ন

অনুশ্রী মাইতি
Email ID : maityanushree84@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Literature, Poetry, Hunting, Novel, Transgender, Born.

Abstract
Brihannalas have a narrow presence in society and literature since ancient times. As they suffer, neglect, ridicule in the society as well as in literature. Unliberated peoples move, talk and talk about the politics of imposition since time immemorial. The black cloud of incomparable power would cover their whole life, there was not a single drop of sunshine to be seen. They had to live in a kind of exile from human life. As time changes, people's hearts and minds change, so do our perspectives, and with this change, we open the doors of truth and unravel the tangle of mysteries. Crossing the deep path of darkness, I see the light. But that light reaches few people, so most people cannot break the veil of superstition and come out. And do we try to pull the exiled people into the dark well even if we see the light? Rather, we know everything and consider them as human beings instead of raising our hands in a hateful mentality, and we stand by and watch them sink into darkness and help them sink deeper. And the drowning deprived people forget to raise their voices in helplessness, they lock themselves up just to survive and therefore do not fight for their rights, thus spending their lives in a kind of survival and non-survival. Along with the change in people's social mentality, there have been various changes in the novel. From 1947 to the present time, they have been revealed in several writing talents through different characters, fragmented and as a whole. The meaning of living as a member of society as a common man is revealed in their voice. The desire to return to the mainstream of society is still embodied in their hearts. They have transitioned from the hijra life to the good system of medicine. Writing about them is less but not less. Their lives have been captured in the pen of several writers. However, even in novels such as their bratya and aparag dasha in the society, their bratya and aparag dasha have not yet been completed.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 342
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

প্রাচীনকাল থেকে বৃহন্নলারা সমাজ ও সাহিত্যে সংকুচিতভাবে বিরাজমান। সমাজে তারা যেমন যন্ত্রণা, অবহেলা, উপহাসের শিকার তেমনি সাহিত্যেও। স্বাধীনতাহীন মানুষগুলি প্রাচীনকাল থেকে চাপিয়ে দেওয়ার রাজনীতিতে নড়ে-চড়ে, কথা বলে। অমোঘশক্তির কালোমেঘ এদের সারাটা জীবন জুড়ে থাকত, সেখানে একফোঁটা রৌদ্রের হাসির দেখা মিলত না। মনুষ্যজীবন থেকে এদের একপ্রকার নির্বাসনে যাপন করতে হত। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের হৃদয় ও মনন পরিবর্তিত হয়, ফলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিরও বদল হয় আর এই বদলের সাথে সাথে আমরা সত্যের দরজা উন্মোচিত করে রহস্যের জট খুলতে খুলতে এগিয়ে যাই। অন্ধকারের গহিন পথ অতিক্রম করে আলোর দেখা পাই। কিন্তু সেই আলো পৌঁছায় কতিপয় মানুষের কাছে, ফলে বেশিরভাগ মানুষ কুসংস্কারের আবরণ ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারে না। আর আমরা আলোর দেখা পেলেও অন্ধকার কূপে নির্বাসন দেওয়া মানুষগুলোকে টেনে তোলার চেষ্টা করি কি? বরং আমরা সবকিছু জেনেও তাদেরকে রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে বিবেচনা না করে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার বদলে ঘৃণ্য মনস্কতায় হাত গুটিয়ে নেই, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা তাদের অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে দেখি ও আরো বেশি নিমজ্জিত হতে সাহায্য করি। আর নিমজ্জমান বঞ্চিত মানুষগুলো অসহায়তায় আওয়াজ তুলতে ভুলে যায়, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য নিজেদেরকে গুটিয়ে খোলবদ্ধ করে নেয় তাই নিজেদের অধিকার প্রাপ্তির লড়াইয়ে নামে না, ফলে একপ্রকার বাঁচা ও না-বাঁচার মধ্যে নিজেদের জীবন কাটিয়ে দেয়। মানুষের সমাজমনস্কতার পরিবর্তনের সাথে সাথে উপন্যাসেও এদের বিভিন্ন পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বেশ কিছু লেখনী প্রতিভায় এরা প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে খণ্ডিতভাবে ও সামগ্রিকভাবে। সাধারণ মানুষের মত সাধারণভাবে সমাজের একজন সদস্য হয়ে বেঁচে থাকার আর্তি প্রকাশিত হয় তাদের কণ্ঠে। সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা এখনও তাদের হৃদয়ে মূর্তিমান। চিকিৎসাশাস্ত্রের সুব্যবস্থায় হিজড়ে জীবন থেকে তাদের উত্তরণ ঘটেছে। এদের নিয়ে লেখালিখি কম হলেও একদম কম তা কিন্তু নয়। বেশ কিছু সাহিত্যিকের কলমে ধরা পড়েছে এদের জীবন। তবে সমাজে এদের ব্রাত্য, অপারগ দশার মতো উপন্যাসেও এদের ব্রাত্য ও অপারগ দশা এখনও সম্পূর্ণ ঘোচেনি।

যে সব উপন্যাসের হাত ধরে আমরা এই প্রবন্ধটির আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাব সেগুলি হল—

১. কমল চক্রবর্তী-র ‘ব্রহ্মভার্গব পুরাণ’ (১৯৭২)
২. মানব চক্রবর্তী-র ‘সন্তাপ’ (১৯৯৩)
৩. মৃণালকান্তি দত্ত-র ‘পাখি হিজড়ের বিয়ে’ (২০১৩)

‘হিজড়ে’ বা ‘হিজড়া’ (Hijra) শব্দটি একটি হিন্দুস্তানি শব্দ, যা আরবি শব্দ হিজর (Hjr) থেকে এসেছে, যার অর্থ নিজের গোত্র ত্যাগ করা আর সেখান থেকেই হিন্দি ভাষায় প্রবেশ করেছে। ‘হিজড়ে কাদের বলা হয়’ এই উত্তর বোধহয় কয়েকটা বাক্য দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয় কিন্তু ‘হিজড়ে’ শব্দকেন্দ্রিক মানুষগুলোকে নিয়ে মানুষের যেমন কৌতুহলের অন্ত নেই তেমনি মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকা প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার অভাব নেই। হিজড়ে নামাঙ্কিত মানুষদের আমরা সাধারণত ট্রেনে, বাসে, রাস্তা-ঘাট, দোকান-বাজার, গ্রামে-গঞ্জে এক নারীমূর্তির বেশে দেখতে পাই কিন্তু এরা সকলেই পুরুষ, পুরুষ চিহ্নকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে ও যথাসম্ভব নারীত্বের আবরণে নিজেদেরকে ঢেকে রাখে। শুধু তাই নয় তাদের পুরুষ চিহ্নগুলো ঢাকা পড়ে গেছে নারী মানসিকতার অন্তরালে। কিন্তু হিজড়ে বলতে আসলে উভলিঙ্গত্ব বা অপূর্ণ লিঙ্গত্ব ধারণ করা মানুষদের বোঝানো হত। বাড়িতে বাচ্চা হলে ঢোল-গানবাজনা সহ তাদের বাচ্চা নাচাতে দেখি, তার বিনিময়ে টাকা ও জিনিসপত্র আদায় করতে দেখি। এই পেশাটি এদের প্রধান ও আদি পেশা। ট্রেনে-বাসে তালি দিয়ে টাকা চাইতে দেখি। দোকান-বাজারে তোলা আদায় করতে দেখি। এরা নিজেরা যত না মানুষদের ভয় দেখায় তার থেকে বেশি মানুষ আগে থেকে পেয়ে বসে থাকে চিরাচরিত প্রথায়। এভাবে এইরকম অর্থ উপার্জন করে একরকমভাবে নিজেদের খাওয়া-পরাগুলো চালিয়ে নেয়। আবার আমরা অনেকসময় সুন্দরী হিজড়েদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, আসলে ওখানে ওরা খদ্দের ধরতে দাঁড়িয়ে থাকে, ওরা যৌন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত।

আমাদের নিজস্ব পৃথিবীর ঘটমান ঘটনার বাইরে যা কিছু ঘটে তাতেই আমরা আস্বাভিবকতার তকমা এঁটে দিই। তাই আমরা অনেকেই অনেকসময় প্রকৃত সত্যকে মানতে অস্বীকার করি। যেমন অস্বীকার করি সমকামী যৌনতা, আমাদের কৌতূহল হয় ওরা কীভাবে যৌন জীবনযাপন সম্পন্ন করে, যেহেতু আমরা অনেকেই তার উত্তর পাইনা তাই ধরে নিই এটা মিথ্যে, এটা অসম্ভব। বেশিরভাগ মানুষ মনে করেন ঈশ্বর যৌনতা সৃষ্টি করেছেন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এবং তা একটা কারণপ্রসূত সেখানে একজন পুরুষের সঙ্গে পুরুষের কিংবা দুজন নারীর মধ্যে প্রেম-যৌনতা কী করে সম্ভব। বেশিরভাগ মানুষ নিজেদের অন্তঃকরণে এই ধারণা পোষণ করেন যে, হিজড়েরা উভয়লিঙ্গত্ব কিংবা লিঙ্গহীনভাবে বা খুঁতযুক্ত লিঙ্গত্ব নিয়ে জন্মায়, কিন্তু সেই ধারণা অনেকাংশে মিথ্যা। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে হিজড়েদের মধ্যে প্রকৃত হিজড়ে মানে উভলিঙ্গত্ব ১% আর বাদবাকি সব পুরুষ। হিজড়েদের একান্নবর্তী পরিবারেও নানা বিভাজন রয়েছে। তাদের সমস্ত সদস্যদের শ্রেণিবিভাজন করলে দেখা যাবে যে, সেখানে সাধারণত পাঁচ ধরনের সদস্য রয়েছে —

১. জন্মগত হিজড়ে (কারোর শুধু প্রস্রাব এর জন্য একটা ছিদ্র থাকে, কারোর বা দুটো অপূর্ণ যৌনলিঙ্গ থাকে, কারোর শুধু যোনি থাকে, কারোর শুধু শিশ্ন থাকে, কারোর ক্লিটোরিস এত বড় হয় যে শিশ্নের আকার ধারণ করে আবার কারোর শিশ্ন এত ছোটো হয় তা ক্লিটোরিসের মতো হয় ফলে অনেকসময় লিঙ্গচিহ্ন নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে যায়, পরবর্তীকালে বড় অবস্থায় জানা যায় যে লিঙ্গ চিহ্ন নিয়ে বড় হয়েছিল সে তার বিপরীত)।

২. ছিবড়ি (এরা সম্পূর্ণ সুস্থ নারী, অর্থনৈতিক কারণে হিজড়ে দলে এসে ঢোকে, এরা অনেকসময় স্বামী পরিত্যক্তাহয়, এরা সাধারণত রান্না-বান্না করা, ঘর সাফাই, ফাইফরমাস খাটে) ।

৩. জেনানা (প্রকৃত পুরুষ, অসৎ উপায়ে সহজে অর্থ উপার্জনের মেয়েদের সাজপোশাক পরে হিজড়ে সেজে ঘুরে বেড়ায়, এরা নারীসত্তাকামী নয়)।

৪. ছিন্নি (এরা পুরুষ, ক্যাস্ট্রেশনের মাধ্যমে লিঙ্গহীন হয়েছে, নারীবেশ ধারণ করে)।

৫. আকুয়া (পুরুষলিঙ্গ চিহ্নযুক্ত কিন্তু নারীসত্তাকামী, জেনানাদের মতো এরা নয়)।

উপন্যাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী হিজড়ে পরিবারের সদস্য চার্ট (%)
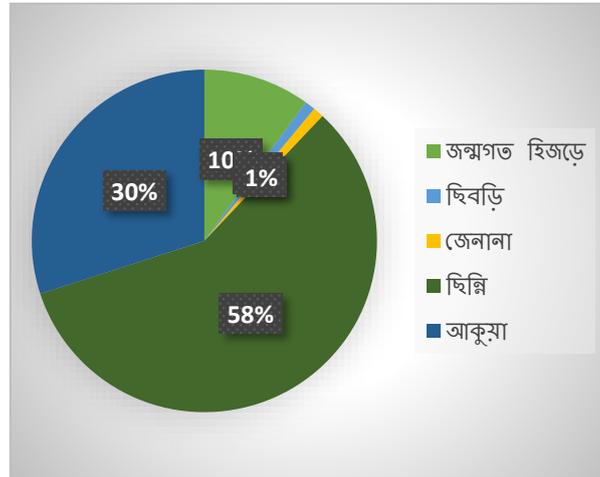
"অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু তাঁদের লেখা 'ভারতীয় হিজড়ে সমাজ' বইতে হিজড়েদের জন্মরহস্যের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হিজড়েদের জন্মরহস্যের পেছনে ক্রোমোজোম ও বারবডির ত্রুটি ও অস্বাভাবিকতাকে দেখিয়েছেন।"[১]

এর জন্য সাধারণত ছয় ধরনের হিজড়ে দেখা যায় —

১. ক্লাইনেফেলটার সিনড্রোম (Klinefelter syndrome)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 342
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২. XXY পুরুষ (XXY Male)
৩. XX পুরুষ (XX Male)
৪. টার্নার সিনড্রোম (Turner Syndrome)
৫. মিশ্র যৌন গ্রন্থির বিকৃতি (Mixed gonadal dysgenesis)
৬. প্রকৃত হিজড়ে (True Hermaphroditism)

১. ক্লাইনেফেলটার সিনড্রোম : এই সব পুরুষরা শারীরিক ভাবে পরিপূর্ণ পুরুষ নয়। এদের দেহে ৪৭ টি ক্রোমোজোম থাকে। ২২ জোড়া অটোজোম, ৩ টি সেক্স ক্রোমজোম (দুটো X ক্রোমোজোম ও একটি Y ক্রোমোজোম)। একটা X ক্রোমোজোম বেশি থাকায় স্ত্রী বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে ওঠে।

২. XXY- পুরুষ : এদের যৌনাঙ্গ পুরুষের মত, শিশ্ন আছে কিন্তু মূত্রছিদ্রটি স্বাভাবিক স্থানে থাকে না। এদের অণ্ডকোশ যথাস্থানে থাকে না থাকে শরীরের অভ্যন্তরে। এদের ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৭। ২২ জোড়া অটোজোম ও ৩ টি সেক্স ক্রোমোজোম (একটি X ও দুটি YY ক্রোমোজোম) থাকে।

৩. XX- পুরুষ : এদের সঙ্গে ক্লাইনেফেলটার সিনড্রোম এর মিল রয়েছে। কিন্তু এদের ক্রমোজোম সংখ্যা ৪৮। এদের অটোজোম ৪৬ টা ও দুটো XX ক্রোমোজোম থাকে আর এরা সাধারণত বেঁটে হয়।

৪. টার্নার সিনড্রোম : এরা মহিলা কিন্তু পুরোপুরি মহিলা নয় কারণ এদের গোপনাঙ্গ ও অনান্য গৌন যৌনাঙ্গ ত্রুটিযুক্ত, স্বাভাবিক নয়। এদের যৌনাঙ্গের সঙ্গে নারী যৌনাঙ্গের আপাত সাদৃশ্য দেখা যায়। এদের একটা সেক্স ক্রোমোজোম (X) থাকে ফলে এদের ক্রোমজোম সংখ্যা ৪৫। কখনো-কখনো ৪৭ (৪৪ অটোজোম + XXX) টাও হয়।

৫. মিশ্র যৌনগ্রন্থির বিকৃতি : এদের আপাতদৃষ্টিতে ছেলে বলে মনে হয়। এদের গোঁফ-দাঁড়ি হয়। শরীরের অভ্যন্তরে একটি শুক্রাশয় থাকে। শুক্রাশয় নালিকার ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে শুক্রাণু উৎপন্ন হয় না। এদের দেহকোশের ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৬ (৪৫ + X) ও (৪৭ + XY) হয়।

৬. প্রকৃত হিজড়ে : প্রকৃত হিজড়েরা সাধারণত তিন ধরনের হয়। প্রথমত, শরীরের একদিকে শুক্রাশয় ও একদিকে ডিম্বাশয় এবং অপরদিকে একটি শুক্রাশয় অথবা একটি ডিম্বাশয় থাকে। দ্বিতীয়ত, একদিকে ডিম্বাশয়, শুক্রাশয় এবং অপরদিকেও ডিম্বাশয় থাকে। তৃতীয়ত, একদিকে একটি ডিম্বাশয় এবং অন্যদিকে একটি শুক্রাশয় থাকে। এইপ্রকার হিজড়েদের অধিকাংশই পুরুষালী। এদের ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৮ (৪৬ + XY) হয়। এছাড়া গোনাডের ত্রুটি ও হরমোন ও এনজাইমের ত্রুটির কারণে হিজড়ে শিশুর জন্ম হতে পারে।

এখন আমরা হিজড়েদেরকে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে থাকতে দেখলেও সমাজের এরা কিন্তু প্রথম থেকে এরকম গোষ্ঠীবদ্ধ ছিল না। বাৎসায়নের ‘কামসূত্রের’ তৃতীয় প্রকৃতিদের সমাজের মধ্যে বসবাস করতে দেখি নানা বঞ্চনার শিকার হয়ে। কিন্তু একসময় তারা নিজেদেরকে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের মতো কিছু মানুষের সঙ্গে সজ্ঘবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরা কত সাল নাগাদ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে থাকার সূচনা করেছিল তা জানা যায় না। তবে কী কারণে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিলেন তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের রদ বদলের সময় নারীরা অন্যান্য ক্ষমতা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে পৌরহিত্য করার ক্ষমতা হারায়। কিন্তু এই ক্ষমতাহরণকারী পুরুষরা দেবীর কোপদৃষ্টির ভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন, তবুও ছিনিয়ে নেওয়া ক্ষমতা ছাড়তে রাজি ছিলেন না, তাই নিজেরা নারীবেশ ধারণ করলেন, লিঙ্গচ্ছেদ করালেন। নপুংসক পুরুষ বা লিঙ্গচ্ছেদ করা পুরুষরা পৌরহিত্যের দায়িত্বে থাকলেন। তারপর সমাজের নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই পুরোহিতরা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন শুরু করলেন সমাজের মূলস্রোত থেকে নিজেদের গ্রন্থি ছিঁড়ে নিয়ে। এই পুরোহিত বৃত্তির কাজ আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে কিন্তু এই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন থেকে তারা আর বেরিয়ে আসতে পারেনি।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 342
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাংলা উপন্যাসে গোষ্ঠীবদ্ধ হিজড়ের দেখা পাই ১৯৭২ খ্রিঃ কমল চক্রবর্তী-র 'ব্রহ্মভার্গব পুরাণ' উপন্যাসে। পুরাণ কাহিনির আঙ্গিকে এই উপন্যাসের আখ্যান গড়ে উঠেছে। হিজড়েদের অনুভূতি, উপলব্ধি ও এই মানুষগুলোকে ঘিরে হিজড়ে পত্রিকার সম্পাদকের নিজস্ব উপলব্ধি তাঁর বয়ানে উঠে এসেছে, যে সম্পাদক এদেরকে মানুষ বলে গণ্যই করেন না। হাত-পা, চোখ-মুখ, দুপায়ে দাঁড়ালে মানুষের মতো দেখতে হলেই যে মানুষ বলে গণ্য হয়ে যাবে তা নয়, মানুষ বলে গণ্য হতে গেলে সঠিক লিঙ্গ চিহ্ন থাকা দরকার, যারা কিনা পরবর্তীকালে প্রজনন করার ক্ষমতা রাখে, তবেই সে মানুষ নামক জীব। নাহলে সম্পাদক কেন বলবে যে, তিনি ঠিক মানুষের নয়, একদল প্রাণীর সম্পাদক। আসলে লেখক এই মানুষগুলোকে এক লিঙ্গহীন বস্তুর জাঙালে নিক্ষেপ করেছেন। কমল চক্রবর্তী সত্য উদ্‌ঘাটন না করে এক মিথ্যার চাদরে মানুষগুলোকে ঢেকে দিয়েছেন। লেখক তাদেরকে যোনিহীন, মুষ্কহীন বলেছেন। এই উপন্যাসে আমরা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের চিত্র দেখতে পাই না, দেখতে পাইনা তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ইতিহাস। সম্পাদকের মতে তাদের নিয়ে একটা অভিধান তৈরি হলে সেই অভিধানে প্রেম, ভালোবাসা, অন্তঃসত্তা, প্রসব, বিপ্লব, সাহস, ইউনিয়ন, স্কুল, মন্দির, বিশ্বাস, ভবিষৎ, বিবাহ, ছুন্নৎ, মুখেভাত এমনই বহু শব্দ থাকবে না, যেমন ওদের জগৎ ছোটো তেমনি ছোটো ওদের অভিধান। কিন্তু সত্যিই কী প্রেম, ভালোবাসা এসব বস্তু নেই হিজড়ে পরিবারে? তাহলে এই উপন্যাসে মির্চা ও শশীকুমার এর সম্পর্ককে কী নামকরণ করব? সম্পাদকের মতে প্রেমের সঙ্গে যৌনতার একটা সম্পর্ক থাকে, যেহেতু মির্চা ও শশীকুমার তথা হিজড়েদের মধ্যে কোনো যৌন সম্পর্ক সম্পাদকের চোখে পড়েনি তাই তিনি প্রেমের সম্পর্ককে খারিজ করেছেন এবং অভিধান থেকেও বাদ দিয়েছেন। মির্চা ছাড়াও শশীকুমারের একটা ভরা সংসার থাকা সত্ত্বেও তার কাছে কাছে বারংবার ছুটে আসার কারণ কী? এর উত্তর মির্চার মৃত্যুর পরে শশীকুমার নিজের মুখেই দিয়েছেন পুলিশের কাছে। শশীকুমার বলেছিল মহিলা ও মির্চার মধ্যে মির্চাই শ্রেষ্ঠ। শশীর বিয়ে হয়েছে, তার দুটি সন্তানও ছিল। মির্চাকে সত্যিকারের রমণী মনে হয়।

বিয়ে এদের সত্যিকারের হয়। তবে এই বিয়ে নিয়েও অনেকসময় বাধে বিপত্তি। হিজড়ে পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের অনেকসময় সুস্থ সবল পুরুষ মানুষরা আবেগের বশে বিয়ে করে ফেলে কিন্তু সেই মুখোশ বেশিদিন থাকে না। সে পরিস্থিতির শিকার হয় ও বাধ্য হয়ে মিথ্যে কথা বলে ফেলে, নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার সাহস পায় না। ২০০২ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল হিজড়ে দুর্গা ও গৌরবের প্রেম ও বিয়েকে ঘিরে নানা জটিলতার কাহিনি। দুর্গা ও গৌরব একে অপরকে বিয়ে করার ফলে দুজনকে জেলে যেতে হয়েছিল। বিয়ে করে রেজিস্ট্রি করতে গেলে আধিকারিক বেঁকে বসেন, তিনি বলেন- হিন্দু মতে নারী-পুরুষের বিয়ে থাকলেও হিজড়ের বিয়ের কোনো নিয়ম নেই ফলে রেজিস্ট্রি সম্ভব নয়। এদিকে দুর্গার দাম্পত্য জীবনের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় সে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। দুর্গা বলে —

> "এবার থেকে আমি আর দুর্গা ঘোষ নই, দুর্গা রায়। আচ্ছা হিজড়ে বলে কি মানুষ নই? আমার কি কামনা-বাসনা কিছু থাকতে পারে না স্রেফ হিজড়ে বলে।"[২]

অন্যদিকে গৌরব বলে —

> "আমাদের মধ্যে দু'বছরের সম্পর্ক, আমি অন্য মহিলার সঙ্গে ওর তফাত বুঝতে পারিনি, এ বিয়ে ভালোবাসার বিয়ে।"[৩]

শশীকুমার বলেছিল মহিলা ও মির্চার মধ্যে মির্চাই শ্রেষ্ঠ। দুর্গা মা হতে চায়, স্বামী-সন্তান নিয়ে ঘর সংসার করতে চায়, তবে অত্যাচারিত হওয়ার ভয়ে শ্বশুরালয়ে যেতে চায় না সে। তার চাওয়ার মধ্যে কোনো ভুল নেই কারণ মানুষের কামনা-বাসনা সমাজের অনুশাসন মেনে চলে না কিন্তু সে ভুল করেছিল অবলম্বনকে বাছতে, যে অবলম্বন অন্য অবলম্বনকে আশ্রয় করে বাঁচে, যে অবলম্বন মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। গৌরবও পরের দিন বাবা-মার কথা শুনে পাল্টি খেয়েছিল। গৌরব নিজের বয়স ২২ বললেও তার বাবা বয়স ১৭ বছর বলে দাবি করে। গৌরব আগের দিন প্রেমের সম্পর্কের কথা স্বীকার করলেও পরের দিন ২৯ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজারে তার সম্পর্ক অস্বীকার করার কথা বের হয়। গৌরব এবার বলে —

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 342
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"আমি বিয়ে করিনি। আমায় জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ের হলফনামায় সই করিয়ে নিয়েছে দুর্গা।"[৪]

এই বিয়ে যে শুধু মূলস্রোতের মানুষ মেনে নেয় না, ভেঙে দিতে চায় তা নয়, আসলে যখন যার স্বার্থে আঘাত লাগে সেই বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, সেটা মূলস্রোতের মানুষ হোক বা হিজড়েদলের সদস্য। 'পাখি হিজড়ের বিয়ে' উপন্যাসে দেখি এমন এক বিরল ঘটনা। নিজেরাই নিজেদের জনকে বাধা দিচ্ছে কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত লাগার জন্য। পাখি ও অর্জুনের বিয়ে ওদের গুরুমা মেনে নেয়নি এবং ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানোর জন্য বারবার আক্রমণ করেছে। পুলিশের কাছে গিয়ে ৩৭৭ ধারার আইন দেখিয়ে ওদের বিয়ে যে অবৈধ, তা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। গুরুমার হাত থেকে বাঁচতে একটু শ্রান্তির জন্য দেশের যে প্রান্তে গিয়ে উঠেছে সেখানে দীনু লোক পাঠিয়ে, প্রতিবেশীদের তাদের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে জীবন অনিষ্ট করে তুলেছে। অর্জুন ও পাখি লড়াই করে শেষ অবধি বাঁচতে পেরেছিল, একে অপরকে ছেড়ে না গিয়ে শক্ত মুঠিতে একে অপরের হাত ধরে রেখেছিল। ৩৭৭ ধারা ২০০৯ সালে উঠে গেলেও লেখক ২০১৩ সালে বসে উপন্যাসে এই ৩৭৭ ধারার প্রয়োগ করেছেন, আসলে তিনি ২০০৯ সালের আগের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। আসলে ৩৭৭ ধারা আইনিভাবে উঠে গেলেও সমাজ এখনও গ্রহণ করেনি।

সম্পাদক মহাশয় বলেছিলেন হিজড়েদের অভিধানে অন্তঃসত্তা বিষয়টি থাকবে না। বাংলা উপন্যাসে এর নজির না থাকলেও এই ঘটনা সমাজে কিন্তু নজিরবিহীন নয়। অন্তঃসত্তা হওয়ার ব্যাপারটি সমাজে ঘটেছে। ১৯৯৭ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় চার পৃষ্ঠার ওপর একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। কিশোরের পেটে চার মাসের ভ্রূণ, ব্যাপক চাঞ্চল্যকর ডাক্তার মহলে। উত্তর বিহারের দারভাঙায় ১৬ বছরের উভলিঙ্গ কিশোরের পেট কেটে চারমাসের একটি মৃত ভ্রূণ পাওয়ার পর চিকিৎসামহলে চাঞ্চল্য দেখা যায়। প্রকৃত উভলিঙ্গের খোঁজ দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া গেলেও তাদের গর্ভধারণের ঘটনা এই প্রথম। তার শরীরে পুরুষ ও স্ত্রী দুই জনন অঙ্গই বর্তমান। প্রথমে চিকিৎসকগন ধারণা করেন যে তার শরীরে শুক্র ও ডিম্বকোশের মিলন ঘটে অটোকিউশন ঘটেছে যেমন ঘটত পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিকে উভলিঙ্গ প্রাণীদের ক্ষেত্রে। গণেশ প্রকৃত উভলিঙ্গ এবং তার শরীরে নারীর লক্ষণ বেশ পরিস্ফুট।

হিজড়েরা সন্তান ধারণে অক্ষম হতে পারে কিন্তু তাদের মূল কাজ এই বাচ্চাদের নিয়ে, বাচ্চাকে আশীর্বাদ করা ও বাচ্চার মঙ্গল কামনা করা। বাচ্চার মঙ্গল কামনায় আজও অনেক পরিবার তাদের ডাকেন। যদিও বর্তমান দিনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংখ্যাটা খুবই কম। 'ব্রহ্মভার্গব পুরাণ' উপন্যাসে দেখি তাজা সিং এর নাতি হতে শশীকুমার দু'হাজার টাকা, রাতের খাওয়ার ও সবার শাড়ি চেয়েছিল তাজা সিং এর কাছে, তার বদলে হিজড়েরা একদিন নেচে আসবে, আশীর্বাদ করে আসবে। হিজড়েরা সন্তান ধারণ করতে না পারলেও তাদের মধ্যে মাতৃসত্তা বাহিত হয়। এমনকি সন্তান ধারণ করতে না পারার যন্ত্রণা তাদেরকে কুরে কুরে খায় তাই যখন দেখে কেউ সন্তান ধারণের ক্ষমতা নষ্ট করছে তখন তারা খুব কষ্ট পায়। একদিকে নিজেদের সন্তান ধারণের অক্ষমতা অন্যদিকে মূলস্রোতের মানুষদের গর্ভধারণ ক্ষমতার উর্বরতা নষ্ট করে দেওয়ার ফলে 'সন্তাপ' উপন্যাসের হিজড়ে সর্দার মুরলী কষ্ট পায়। মশলাদার, ঝালচানা বিক্রি করা শংকরিয়ার বউ তিনটে বাচ্চা হতে বাচ্চা না হওয়ার অপারেশন হয়ে আসে। একদিকে শংকরিয়ার বউ সৃষ্টিশীলতা থেকে সৃষ্টিহীনতার দিকে গেছে, উৎপাদন ক্ষমতাকে নিজের ইচ্ছায় কয়েকটা যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিনষ্ট করেছে অন্যদিকে মুরলী নিজের মধ্যে সেই উর্বরতা নেই বলে নিজের অন্তকোণে জমে থাকা যন্ত্রণায় ছটফট করেছে। যেন একদিকে উশর মরুভূমি অন্যদিকে সবুজ কৃষি ক্ষেত্র। এভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে বাচ্চার সংখ্যা ক্রমশ কমছে ফলে তাদের পেশায় ভাটা পড়ছে। হাসপাতালে বড় বড় বিজ্ঞাপনের সমাহার যা সবসময় মানুষকে সচেতন করতে ব্যস্ত, বড় বড় লাইনে লেখা দুটির পর আর নয়, তিনটির পর কখনও নয়। ফলে তাদের এই দিক দিয়ে আয় ক্রমশ কমছে। মুরলীদের কথায় এই আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে ১৯৫০ সালে যেখানে জন্মহার ছিল ৪৪.১৭৫ সেখানে ২০২২ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১৭.১৬৩ তে। একদিকে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষার ক্রমবিস্তার, নারীদের কর্মব্যস্ততার জন্য ক্রম হ্রাসমান জনসংখ্যা অন্যদিকে মানুষের বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাভাবনা উন্নতির ফলে কেউ আর এই তুকতাক এ বিশ্বাস করে না তাই নিজে থেকে কেউ এদেরকে বাচ্চা নাচানোর জন্য ডাকে না।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 342
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সম্পাদকের মতে হিজড়েরা যোনিহীন তাই ওরা মস্তিষ্কহীন-স্মৃতিহীন তাহলে কি যৌনলিঙ্গের সঙ্গে, যৌনতার সঙ্গে স্মৃতি ও বুদ্ধির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রয়েছে? এটা বোধহয় পুরানো প্রচলিত ধারণা থেকে এসেছে তার কারণ মেয়েদেরকে কম বুদ্ধিসম্পন্ন বলে মনে করার রীতি সমাজে প্রচলিত। মেয়েরা কোনো ভুল করলে অবলীলায় বলে দেওয়া হয় মেয়েমানুষের বুদ্ধি। মেয়েদের মাথা কম, কোনো জটিল বিষয়ের সমাধান নাকি মেয়েরা করতে পারে না। মেয়েদের লিঙ্গচিহ্নের জন্য যদি এরকম বলা হয় তাহলে লিঙ্গহীন মানুষদের সম্পর্কে কেউ এসব সহজেই বলতে পারে। যেহেতু ওরা স্মৃতিহীন তাই মির্চার স্মৃতি বেশিদিন ওদের মনে থাকবে না। মির্চার মৃত্যুতে শশীকুমার সবথেকে বেশি ভেঙে পড়েছিল। পুলিশ তাকে অনেক প্রশ্ন করেছিল। শশীকুমার জানিয়েছে মির্চার মধ্যে নারী-পুরুষের উর্দ্ধে এক জীবন ছিল। এমনকি মেয়েমানুষ ও মির্চার মধ্যে মির্চাকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেছিল। এই উপন্যাসে একটা মিথের মাধ্যমে ইন্দ্রের অভিশাপে হিজড়েদের জন্মের কাহিনি জানতে পারি এবং ইন্দ্র তাদের যৌনতাহীন হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিল। ইন্দ্র ওদের যতই যৌনতাহীন হওয়ার অভিশাপ দিক আর সম্পাদক মহাশয় যতই ওদের যৌনতাহীন, মস্তিষ্কহীন বলুক ওরা কেউই যৌনতাহীন নয়। 'ব্রহ্মভার্গব পুরাণ' উপন্যাসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের যৌনতা জড়িয়ে থাকত একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে। মির্চাকে হিজড়ে ভাবতে কষ্ট হত সম্পাদকের। কিন্তু মির্চা যখন সম্পাদককে জড়িয়ে ধরেছিল, তখন অন্য কিছুর জন্য খারাপ লাগেনি, খারাপ লেগেছিল নিজেকে হিজড়ের প্রেমিক ভেবে, ঘৃণায় নিজের শরীর গুটিয়ে নিয়েছিল, এতটা ঘৃণা যে বমি হয়ে যেতে পারত। স্পর্শের অনুভূতিতে কিছু মনে হয়নি ওঁনার, মনে হয়নি এটা হিজড়ে স্পর্শ, শুধুমাত্র তাঁর ভাবনাতে হিজড়ে ছোঁয়াচ লেগেছিল। এ পাড়ার কিছু লোকজন আসত তা যৌনতার জন্য। একদিন দেখা গেল—

> "সোমত্থ পুরুষ হিজড়েদের পেছনে ঘুরে বেড়াতে দেখলুম। হিজড়ের মন জোগাতে দেখলুম। দেখলুম হিজড়ের মুঠো ভরে যাচ্ছে লিপস্টিক, আলুর চপ, বেগুনি, সিফেনে। হিজড়ে কাঠের পায়ের পাতা ভরে যাচ্ছে নুপূরের ছন্দে।"[৫]

হিজড়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা কিভাবে বেড়ে চলে তার একটি ধারণা পাওয়া যায় এই উপন্যাসের 'ফাৎনা' পত্রিকার মধ্য দিয়ে। হিজড়েরা আসে কীভাবে? তারা নিজেরাই আসে নাকি কেউ তাদের নিয়ে আসে? এই প্রশ্নের উত্তর এই বইয়ের পত্রিকায় সম্পাদিত দুজনের লেখনী থেকে জানা যায়। হিজড়েরা যেমন তাদের মত কাউকে দেখতে পেলে জোর করে ধরে নিয়ে যায় তেমনি অনেকে আছে যারা নিজেরাই তাদের কাছে এসে ধরা দেয়। কেউ কেউ আবার স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে পরিবারের সান্নিধ্যে কাটানো অতীত সুখস্মৃতির উদ্‌গিরণ করেছে কিন্তু তাদের এখানে আসার যাত্রাপথটি প্রকাশ করেনি। ভুবনেশ্বর থেকে আদু লিখেছেন তিনি ক্লাস ফোর অবধি পড়েছেন। আদুর বয়স যখন ১০ বছর তখন হিজড়ে লালিকা ও তার চার-পাঁচজন সঙ্গী তাকে নিতে আসে। লালিকা বলে— এ জিনিস ঘরে রাখা পাপ, তাদের বাচ্চা তাদের দিতে হবে, বাবা-মাও তাকে বোঝায় আদু তাদের বাচ্চা, এতদিন তারা রেখেছিল, এখন তাদের কাছে চলে যেতে হবে। আদুর তাদের সঙ্গে থেকে কোনো কষ্ট হয়নি বরং পুরুষ মানুষ তার কাছে এসে বসে, নাচ দেখে, খারাপ কাজ করে। আদু এইসব বিষয়গুলো আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করে। একজন কাটোয়া ধুবলি থেকে লিখেছে কিন্তু পরিচয় গোপন করে। সে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এসে হিজড়ে দলে যোগ দিয়েছে। বড় হয়ে নিজেকে নপুংসক ভাবলেও সবার মধ্যে সে পুরুষ পরিচয়ে বড় হয়েছিল, সে যে নপুংসক সেটা বুঝতে তার পঁচিশ বছর সময় লেগেছিল, আর সবকিছু ছেড়ে আসার ডিসিশন নিতে আরও দশ বছর সময় লেগেছে। আসলে এই মানুষগুলোর পুরুষ লিঙ্গচিহ্ন থাকলেও অনুভূতি পুরুষ মানুষের মতো হয় না। এই মানুষটির বয়ান দেখে বোঝা যায় মানুষটি পুরোপুরি উভলিঙ্গ বা যোনিহীন নয়, পুরুষ লিঙ্গচিহ্ন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল কিন্তু তা হয়তো কোনোদিক থেকে পরিপূর্ণ ছিল না তাই পুরুষত্বের অভাব দেখা গিয়েছিল। এইজন্য ছোটোবেলা থেকে পুরুষ লিঙ্গ হিসাবে বড় হলেও সঠিক বয়সে এসে আসল সত্য জানতে পেরেছিল।

এই উপন্যাসে আমরা হিজড়েদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের পরিচয় পেলেও তারা কীভাবে বসবাস করে, কোথায় বসবাস করে তার আবহাওয়া কেমন তার সম্যক পরিচয় পাই না, শুধু এটাই জানতে পারি যে সন্ধ্যেবেলা তাদের গানের রিহার্সাল কিংবা সাজসজ্জার কৃত্রিমতা, উঠোনের দড়িতে ব্লাউজের সারি, থাকার জন্য একসঙ্গে সারিবদ্ধ চারটি ঘর কিংবা

যাদের বাথরুমের কোনো দরজার বালাই নেই এই পর্যন্ত এর বাইরে কিছু জানতে পারিনা। তাদের বসবাসের রীতিনীতি কিছুই এই উপন্যাসে পাওয়া যায় না। ১৯৯৩ সালে মানব চক্রবর্তী তাঁর 'সন্তাপ' উপন্যাসে হিজড়েদের বস্তির পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন। তারা যে বস্তিতে থাকে তার পরিবেশে কেমন সেটা বুঝতে পারি, তাদের বস্তির নাম 'তিতলিবস্তি'। বস্তির নাম 'তিতলিবস্তি' হলেও সেখানকার পরিবেশ ঠিক উল্টো। তিতলি শব্দের হিন্দি অর্থ হল প্রজাপতি। প্রজাপতি রঙিন ফুলের দিকে আকৃষ্ট হয় ও সেখানে বসে। তাই বস্তির নামকরণ অনুযায়ী বস্তির মানুষগুলো ও তাদের জীবন রঙিন হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তিতলি বস্তির মানুষগুলোর জীবন ধূসর, সবচেয়ে বড় কথা হল এখানে আলো ঢোকার সুযোগ পায় না, এখানে যুগ যুগ ধরে অন্ধকার জমে জমে জমাটবদ্ধ হয়েছে। ফলে এখানে প্রজাপতি বসে না, যেমন বাস্তবে বসে না তেমনি স্বপ্নেও না। অতি ক্রুর বাস্তবের কাছে স্বপ্নরা আসতে পারে না। বাতাস ও পরিবেশে এত প্রতিবন্ধকতা যে সূর্যের আলো আসে অতি সঙ্গোপনে। এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দ্বিধার শিকল পায়ে কদাচিৎ ফুল ফোঁটে টাঁড়ামাটির রুখু বুনোঝোপে। এ প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটা কবিতা খুব মনে পড়ছে, আর সেটা হল 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতার সেই বিখ্যাত কয়েকটা লাইন —

> "শান বাঁধানো ফুটপাতে
> পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
> কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে হাসছে।"[৬]

'তিতলিবস্তি' কান্না সঙ্গোপনের জায়গা। তিতলিবস্তি তে রয়েছে ছিরিছাঁদহীন সারি সারি ঘর। মাটি, ভাঙা অ্যাসবেসটারের টুকরো, চাটাই, দরমা, পিচের ড্রাম পিটিয়ে সিধে করা কৃষ্ণবর্ণ টিন, সব মিলে মিশে ঘরগুলোর আকৃতি অদ্ভুত। মানুষগুলোর মতোই অদ্ভুত। নালি উপচানো কালো জল ও মশককুলের নিশ্চিন্ত পোঁ পোঁ শব্দের মাঝে, লোম ওঠা ঘেয়ো কুকুরের মরণমুখী চাহনি ও মৃত ছুঁচোর দুর্গন্ধে প্যাঁচালো বাতাসের মাঝে তবু ওরা গান গায়। কর্কশ গলায় হাসে। ঘুঙুরের বোল ওঠে। ওরা গান গায়। তিতলি বস্তির অন্ধকার তবু কাটে না। এই অন্ধকার মানুষ জীবনের অতলস্পর্শী সেই খাঁড়ি, যেখানে আশা-আকাঙ্ক্ষাহীন অনাদর অবহেলায় পাথরের মতো একা —

> "সমাজসংসারে ছিছিক্কারে নিয়ত দগ্ধ কিছু মানুষ কান্নাকে গোপন করে বিকৃত উল্লাসের মানসিকতায়। ওদের চোখের গাঙ খটখটে। মানুষের তির্যক চাহনিতে নিঃসৃত ঘৃণা ও উপেক্ষার শত তীব্র বুকে নিয়ে, এ জীবনের যাবতীয় লজ্জা থেকে নিজেদের বাঁচাতে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে এই নির্বাসন।"[৭]

মানব চক্রবর্তীর এই উপন্যাসের বয়ান থেকে বোঝাই যায় সমাজের তৈরি মানসিক অত্যাচারের শিকার হয়ে নিজেদেরকে বাঁচাতে এই অন্ধকারময় জীবনে অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু তবুও ওরা হাসতে ভোলে না, নাকি নিজেদেরকে ভোলাতে এই হাসির উৎস? 'সন্তাপ' উপন্যাসে প্রকাশকের কলমেও বর্ণিত হয়েছে ওদের জীবনকাহিনির কিছু কথা। তিনি প্রচ্ছদের নেপথ্য পাতায় লেখেন—

> "কেমন বেঁচে থাকা ওদের? তিতলিবস্তির ওই মানুষগুলোর? মানুষের তির্যক চাহনি থেকে নিঃসৃত ঘৃণা উপেক্ষার সহস্র তির নিয়ত যাদের বিদ্ধ করে? মানুষের সমাজেই জন্ম, তবুও সেই সমাজে লালিত-পালিত হবার অধিকার যাদের নেই? জন্মগত এক খুঁতের কারণে জননীর কোল থেকে, পারিবারিক জীবন থেকে মায়া-মমতা-প্রেম-ভালোবাসার জগৎ থেকে চিরকালের জন্য যারা নির্বাসিত? কেমন চেহারা সেই সমাজের, যে সমাজের ওদের নিজেদেরই নিতে হয়েছে গড়ে? অনাত্মীয়, অভিশপ্ত পিছুটানহীন একদল মানুষ যারা না-পুরুষ, না-নারী? শুধু তিতলিবস্তিতেই নয়, সর্বত্র রয়েছে ওরা।"[৮]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 342
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'সন্তাপ' উপন্যাসের চরিত্ররা— মুরলী, জেনা, কানহাইয়া, কামু, বিন্তি। এরা সবাই জন্মগত হিজড়ে। এদের সকলের বিকৃত যৌনাঙ্গ। আগের 'ব্রহ্মভার্গব পুরাণ' উপন্যাসে যেমন দেখি তারা সকলেই যৌনাঙ্গহীন, তাদের কারোর কোনো লিঙ্গচিহ্ন ছিল না, মানব চক্রবর্তী তাদেরকে যৌনাঙ্গহীন থেকে করে তুললেন বিকৃত। এরা না নারী না পুরুষ। ১৯৪৭ খ্রিঃ তারাশঙ্কর যেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, নসুবালাকে শরীরে পুরুষ ও অন্তরে নারী দিয়ে গড়েছিলেন কিন্তু তার এত বছর পরেও মানব চক্রবর্তী সেটা উপলব্ধি করতে পারলেন না হয়তো বা উভয়লিঙ্গদের প্রাধান্য দেবেন বলে হিজড়েদের এরকম রূপ দিয়েছেন। লেখক হিজড়েদের মধ্যেও বিভাজন গড়েছেন, তিনি ছেলে হিজড়ে ও মেয়ে হিজড়ে বলেছেন। হিজড়ে সর্দার মুরলী নারী মন পেয়েছে আর যার অংশ হিসেবে একজন মায়ের মনের উপস্থিতি প্রকটভাবে ধরা দিয়েছে।

> "মাঝে মাঝে মনে হয় লখাইয়ের, ভগবান মুরলীকে যা দেয়নি, তার চেয়ে মূল্যবান একটা হৃদয় দিয়েছে, যাদের সব নিঁখুত থাকে, তাদের ও এত সুন্দর একটা মন থাকে না।"[৯]

কমল চক্রবর্তী হিজড়েদের যৌনতা মানতে চাননি ও দেখাননি। শুধুমাত্র 'ব্রহ্মভার্গব পুরাণ' এ উল্লেখিত 'উপত্যকা নাইকত কাব্যে' বাচ্চা শার সঙ্গে ছলা কলা রপ্ত করা হিজড়েদের যৌন সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কথক গোটা উপন্যাস জুড়ে কোথাও স্বীকার করেননি তাদের যৌনতার কথা। মানব চক্রবর্তী তাঁর 'সন্তাপ' উপন্যাসে হিজড়েদের যৌনতার আভাস দিয়েছেন। সমাজ যাদের নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন বলে দেগে দেয় তাদেরও সহৃদয়তার পরিচয় পাই মুরলী চরিত্রের সীমাহীন মাতৃত্বের মধ্য দিয়ে। প্রতিবন্ধী ছুকুর অসুস্থতায় হাউমাউ করে কেঁদেছে। জন্ম না দিয়েও যে মা হওয়া যায় তার অন্তরের মাতৃত্বের গুণে, বেশিরভাগ সময় অনেকে সেটা বুঝতে পারে না। ছুকুর জন্য মুরলীর কান্না দেখে এক মাতাল মুরলীকে তার মা ভেবেছিল কিন্তু পাশের জন তার ভুল ভাঙালেন এই বলে যে, হিজড়া আবার মা হয় নাকি। তখন মাতাল বলে, এমন উথাল-পাতাল মা ছাড়া আবার কেউ কাঁদে নাকি? হাসপাতালের ডাক্তারেরা শরীরের অসুখ নিখুঁত পর্যবেক্ষণ করতে পারলেও, তাঁরা সবাই মানুষের মন নিরীক্ষণ করতে পারেন না তাই ছুকুকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গেলে রাতের অন্ধকারে ডাক্তার মুরলীকে ছুকুর মা বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু যখন জানলেন মুরলী হিজড়া তখন তাঁর মুখ থেকে ভীষণ ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে —

> "ডাক্তার গুণধর মণ্ডলের ততক্ষণে ভিরমি খাওয়ার অবস্থা। ...সম্বোধনে আপনি থেকে নেমে এল তুই এ। ডাক্তার ঝেঁঝে বলল, অন্ধকারে দেখলাম মেয়েছেলে, আলোতে দেখি হিজড়া। ...তা তুই মিছা বললি কেনে? ইয়ের আবার মা হবার শখ। ...কত মেয়েছেলে মা হবার জন্য মাথা খুঁড়ছে, জলের মতো টাকা খরচ করছে, আর ওনার শখ হয়েছে মা হওয়ার! ...আরে বাবা আগে তো মেয়েছলে হ, তারপর মা হোস।"[১০]

'ব্রহ্মভার্গব পুরাণ' উপন্যাসে যেমন যোনিবিহীন হিজড়েদের দেখি তেমনি 'পাখি হিজড়ের বিয়ে' উপন্যাসে দেখি যে, মূল চরিত্র পাখিও এইধরনের। অন্য উপন্যাসগুলিতে হিজড়ে পরিবার ও হিজড়েদের বাড়ি ত্যাগ করার চিত্র দেখি কিন্তু 'পাখি হিজড়ের বিয়ে' উপন্যাসে পাখির চিত্র একটু অন্যধরনের। বিপাশা ওরফে পাখির জন্মের সময় হাসপাতালে ডাক্তার লিঙ্গহীনতার কথা প্রকাশ করে। ডাক্তার তাকে ট্রান্সজেন্ডার বলে চিহ্নিত করেছিল। তার বাবাকে ডাক্তার বুঝিয়েছিলেন তাদের মেয়ে আর সব দিক থেকে পরিপূর্ণ। একজন প্রতিবন্ধী শিশুর থেকে, মানসিক জড়বুদ্ধি সম্পন্ন শিশুর থেকে সে অনেক বেশি সবল। খেলাধুলা, লেখাপড়া, গানবাজনা সবই সে করতে পারবে। একটা ছেলে-মেয়ে জন্ম হওয়ার পেছনে একজন মহিলার যেমন কোনো দোষ থাকে না তেমনি একজন শিশুর লিঙ্গহীনতা বা অপূর্ণ লিঙ্গত্ব এর পেছনে বাবা-মার কোনো হাত থাকে না। ডাক্তার বিপাশার জন্মের পর যাতে এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো ঝামেলা উদ্ঘাটন না হয় তার জন্য পুরো ব্যাপারটি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলেছিলেন। এতে বাবা-মায়ের যে কোনো দোষ থাকে না সেকথা তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে এই নিয়ে তাদের পরিবারে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হতে দেখা যায় না।

হিজড়ে শিশুর জন্মের কারণ এই অধ্যায়ের প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে, ডাক্তারও একই কথা বলেছেন। ক্রোমোজোম ও হরমোন সমস্যার কারণে মূলত হিজড়ে শিশুর জন্ম হয়। ডাক্তার রায় বিপাশার বাড়ির সবাইকে পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তান এর জন্ম প্রক্রিয়া বুঝিয়ে বলেছিলেন।

♀ ♂	22A + X	22A + Y
22A + X	44A + XX কন্যা সন্তান	44A + XY পুত্র সন্তান
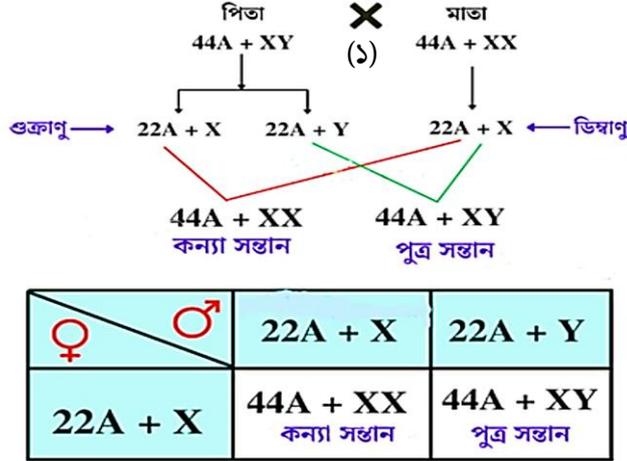
কিন্তু কোনো কারণে 44XX বা 44XY না হয়ে যদি ব্যতিক্রম হিসেবে 44X, 44XXY, 44XXXY হয় তাহলে তার থেকে হিজড়ে শিশুর জন্ম হয়। এদের ঝাঁটার কাঠির মতো প্রস্রাবদ্বার থাকে। কিন্তু হিজড়েদের গঠন যে অন্যরকম হতে পারে তা জানাননি, আসলে এঁরা বৃহন্নলা বলতে যোনিহীনকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু ডাক্তার এসব বোঝাতে গিয়ে একটি ভুল করেছেন। তিনি 'গে' দের হিজড়ে আসনে বসিয়েছেন। তিনি বলেছেন— একদল পুরুষ অঙ্গ নিয়ে জন্মালেও হরমোন জনিত কারণে অর্থাৎ অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে প্রচুর পরিমাণে হরমোন ক্ষরিত হওয়ায় ক্রমশ হিজড়েতে পরিণত হয় আর এরাই 'গে'। সাধারণ নিয়ম অনুসারে একটা মানুষের যৌন অভিমুখ (Sexual Orientation) বিপরীত লিঙ্গের দিকে হয় কিন্তু 'গে', 'লেসবিয়ান'দের যৌন অভিমুখ সমলিঙ্গের দিকে থাকে কিন্তু তাদের তো আর হিজড়ে বলে অভিহিত করা যায় না, হিজড়েরা যেহেতু অন্তরে নারী হয় তাদের যৌন অভিমুখ পুরুষের দিকে সেইদিক থেকে তারা বিষমকামী আবার সমকামী বলা যেতে পারে যেহেতু শারীরিক গঠনগত দিক দিয়ে পুরুষ হয়েও তারা একজন পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়। ডাক্তার রায় আসলে ট্রান্সজেন্ডার দের সঙ্গে 'গে' দের মিলিয়ে দিয়েছেন। একজন ট্রান্সজেন্ডার নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চায় যেটা 'গে', 'লেসবিয়ান' দের কখনও মনে হয় না।

সখীসোনাকে আনার সময় তার মা আটকাতে পারেনি, সখীসোনাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু বিপাশার (পাখি) ক্ষেত্রে উল্টো চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে। পরিবার তাকে বারবার সংরক্ষণ করেছে। নিজেদের মতো কাউকে দেখলে নিজেদের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ করার লোভ সামলাতে পারে না হিজড়েরা। বিপাশা ও তার বাড়ির বিরুদ্ধে হিজড়েরা এক গোপন চক্রান্ত করে চলেছে বছরের পর বছর ধরে তা কেউই টের পায়নি। একটা ভালো সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুনছিল, দিনে দিনে বিপাশার রূপ-সৌন্দর্য যত বেড়েছে তাকে ঘিরে দীনুর লোভ-আকাঙ্ক্ষা তত বেড়েছে। একদিকে পরিবারের মানুষরা বিপাশাকে হিজড়েদের কাছ থেকে আড়াল করার প্রয়াস চালিয়েছে অন্যদিকে হিজড়েরা বিপাশার শিকড় আলগা করার চেষ্টা করেছে। বিপাশা ও তার পরিবারের অন্তরালে হিজড়েরা ষড়যন্ত্রের যে জাল বিছিয়ে রেখেছিল, বিপাশা তাতে সহজেই ধরা দিয়েছে। হঠাৎ করে কঠিন সত্যের মুখোমুখি হওয়া বিপাশা, তার কঠিন শারীরিক বাস্তবের জন্য তার প্রেমিককে হারিয়েছিল। তাদের ভালোবাসা এক লহমায় তাসের ঘরের মতো বিনষ্ট হয় তার এই বাস্তবের জন্য, তাদের দুজনের বিয়ে করার স্বপ্নও ভেঙ্গে যায়। প্রেমিককে ঘিরে দেখা স্বপ্ন যখন পর্যবসিত হল না তখন সে স্বপ্ন পূরণ করতে মরিয়া হয়ে উঠল, তারপর হিজড়েদের দেওয়া যৌনতার উস্কানি তাকে আরও পাগল করে তুলেছিল বিয়ের জন্য এবং তার জন্য হিজড়ে বস্তিতে প্রবেশ করেছিল।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 43
Website: https://tirj.org.in, Page No. 331 - 342
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাখি হিজড়ের বিয়ে' উপন্যাসে বিপাশার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখি, বিপাশা ছিল যোনিহীন। তার পরিবার জানত না খেলায় এরা বাদ পড়ে। খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য ছেলে ও মেয়ে হতে হয়। ছোটবেলা থেকে বিপাশার প্রতিবছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দৌড়ে প্রথম প্রাইজ বাঁধা থাকত। বিপাশা ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় রাজ্য অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় আশাতীত ফল করেছিল, পরেরদিন কাগজে খবর বেরিয়েছিল কর্ণাটকের মনীষাকে ছাড়িয়ে গেল বাংলার বিপাশা। সর্বভারতীয় খেলায় মেয়েদের ৪০০ মিটার দৌড়ে বিপাশা সোনা জিতেছিল, পুরস্কার দেওয়ার আগে তার লিঙ্গ পরীক্ষা করে জানা গেল বিপাশা একজন ট্রান্সজেন্ডার। ফলে তার নাম কেটে দেওয়া হয়েছিল।

এই পুরস্কার কেড়ে নেওয়ার ইতিহাস আজকের নয়, ১৯৩৬ সাল থেকে হয়ে আসছে। ১৯৩২ সালের অলিম্পিকের আসরে মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ে স্টেলা ওয়ালস নামে পোল্যান্ডের এক দৌড়বিদ রেকর্ড সময়ে সোনার পদক জিতলে অলিম্পিক কমিটির কার্যকরী সদস্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাভারি ব্যানডেজের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। তাঁর মৃত্যুর পর জানা যায় স্টেলা ট্রান্সজেন্ডার ছিলেন। ১৯৩৬ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে মিঃ ব্যানডেজের সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর মূলত ওঁরই উদ্যোগে লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি চালু হয়। বার্লিন অলিম্পিকে হাইজাম্পে চতুর্থ স্থানাধিকারী ডোরা রাটজেনের লিঙ্গ নির্ধারণ করে জানা যায় যে, উনি ট্রান্সজেন্ডার ছিলেন। ফলে তার পদক কেড়ে নেওয়া হয়। ১৯৫০ সালে ডাচ ক্রীড়াবিদ ফিকাজে ডাইলেমাকে পরীক্ষা করে জানা যায় যে তিনিও ট্রান্সজেন্ডার ছিলেন ফলে তাঁর পদকও কেড়ে নেওয়া হয়। এরপর ২০০৬ সালে কাতারে আয়োজিত এশিয়ান গেমস ৮০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় ভারতের তামিলনাড়ুর সাঁথি সৌনডোরারাজন রৌপ্য পদক পাওয়ার পর লিঙ্গ নির্ধারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ায় তার পদক কেড়ে নেওয়া হয়। এরা নিজেদের লিঙ্গ সম্বন্ধে জানতেন না, এরা ছোটোবেলা থেকে নিজেদের এক লিঙ্গ হিসেবে জেনে এসেছে কিন্তু পরীক্ষার পর জানা যায় এরা বিপরীত লিঙ্গের। আসলে এরা ইন্টারসেক্স। এদের আমরা রূপান্তরকামী বা রূপান্তরিত লিঙ্গ বলতে পারব না।

'হলদে গোলাপ' উপন্যাসে এরকম এক চিত্র পাই তৃপ্তি চরিত্রের মধ্য দিয়ে। তৃপ্তি বেঙ্গল অ্যাথলেট জুনিয়ারে মেয়েদের মধ্যে সেকেন্ড হয়েছিল। আরও দুটো-তিনটে প্রাইজ জিতেছিল। ১৬ বছর বয়সে যখন রজঃস্বলা হল না তখন ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গেল তৃপ্তির ইউটেরাস, ওভারি নেই। ভ্যাজাইনা আছে কিন্তু সেটা খুব ন্যারো। নকল ভ্যাজাইনা বানানো যায় কিন্তু নকল ইউটেরাস বা ওভারি তো তৈরি করা যায় না। তৃপ্তি নিজেকে পুরুষ মনে করতে বেশি ভালোবাসত। পুরুষের অঙ্গ পেতে চেয়েছিল। তৃপ্তি রেলের চাকরি পেয়েছিল এক সময়। সে যেহেতু মনের দিক থেকে পুরুষ ছিল তাই মেয়েদেরকে ভালোবাসত, কলেজে পড়াকালীন সে মেয়ে কিনা তা পরিমলকে দিয়ে যৌন কার্য সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। চাকরি পাওয়ার পর একদিন সুমিতা হালদারকে ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশ তৃপ্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং সুমিতা বলে বহুদিন ধরে সুমিতা ধর্ষিত হয়ে আসছে। তাহলে সুমিতা এতদিন চুপ ছিল কেন? তৃপ্তি বলে সুমিতা তাকে টাকার জন্য ফাঁসিয়েছে। এদিকে ডাক্তার বলে তার পেটে অণ্ডকোশ বর্তমান। এখন তার চাকরি ও খেলার মেডেলগুলো সংকটের মুখে, যদি সে ডাক্তারি পরীক্ষায় মেয়ে বলে বিবেচিত হয় তবে সে চাকরিটাকে রক্ষা করতে পারবে, মেডেলগুলো রক্ষা করতে পারবে না হলে সবকিছু কেড়ে নেওয়া হবে। অনেকসময় ক্লিটোরিস বড় হয়ে যায় ফলে তাকে ছেলে মনে হলেও সে মেয়ে আবার অনেকসময় শিশ্ন ছোটো হয়ে ক্লিটোরিসের আকার ধারণ করে ফলে তাকে মেয়ে মনে হলেও সে ছেলে, তার পেটে অণ্ডকোশ বর্তমান যেটা সহজে কেউ টের পায়না যা পরবর্তীকালে ধরা পড়ে, অনেকসময় লুকিয়ে থাকা এই টেস্টিসে ক্যানসার ধরা পড়ে। তৃপ্তির বিপরীত অবস্থা 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসের অভিরূপের, যার ক্লিটোরিস এত বড় যে তাকে ছেলে বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু আসলে সে মেয়ে, এই সব অবস্থায় ছোটবেলায় অপারেশন করলে ঠিক হয়ে যায়।

'উপত্যকা নাইকত কাব্যে' কুতুইরা একভাবে মুক্তি পেতে চেয়েছিল কিন্তু 'ব্রহ্মভার্গব পুরাণ' এ হিজড়েরা পরজন্মে মুক্তির প্রার্থনা করেছে। যারা কিনা বিদেশের হিজড়েদের স্বাধীনতার বিষয়ে জ্ঞান রাখেন, ভারতবর্ষের চিকিৎসা ব্যবস্থার তখন আধুনিকীকরণ হয়নি বলে তারা ভাগ্যের ওপর ও পরজন্মের ওপর আশান্বিত, পরজন্মে মুক্তি পেতে চেয়েছেন এই অভিশপ্ত জীবন থেকে। 'ব্রহ্মভার্গব পুরাণ' উপন্যাসের চরিত্রদের লেখক করে তুলেছেন যোনিহীন, লিঙ্গহীন। লেখক তাদের

লিঙ্গহীন করে তুললেও তিনি পাশ্চাত্যের নানা অপারেশনের বিষয়ে সচেতন ছিলেন কিন্তু সচেতন ছিলেন না কাদের এই অপারেশন করা হয়। আসলে তিনি 'তৃতীয় প্রকৃতি' কারা এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন না তাই রামভরোসা সম্বন্ধে বলতে পেরেছিলেন রামভরোসাকে ঠিক হিজড়ে বললে বাড়িয়ে বলা হবে, কারণ সে একজন সুস্থ পুরুষ হতে গিয়ে অল্পের জন্য এ আঁধার পেরোতে পারেনি, ফেলোপিয়ান টিউবে কোথাও একটা কাঁটা লুকানো ছিল। হাজার বছরের পুরোনো মাটি ঠেলে একটা চোখ, মুখহীন তেলেতেলে কেঁচো কোনোক্রমে বাইরে এসেছে। রামভরোসা চেয়েছিল পাশ্চাত্যের মতো এদেশের হিজড়েদের অপারেশনের মাধ্যমে হিজড়ে থেকে মানুষে পরিণত করতে। হিজড়েদের এইসব স্বপ্ন আজকের অনেকটা বাস্তবায়িত হয়েছে কিন্তু সেইসময় দাঁড়িয়ে ঔপন্যাসিকরা তাদের চরিত্রদের স্বপ্নকে সফল করতে পারেননি তাদের লেখনীতে।

Reference:

১. বসু, নিলয়, লন্ডা- ড্যাঙ্গার অন্য হিজড়ের ভিন্ন ভুবন, অনুষ্টুপ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ. ৭
২. আবেদিন, অনল, দেবীপক্ষের দ্বারে স্বীকৃতির দাবিতে দুর্গা, আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০২, পৃ. ১
৩. আবেদিন, অনল, 'দেবীপক্ষের দ্বারে স্বীকৃতির দাবিতে দুর্গা', আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৮ সেপ্টেম্বর,২০০২, পৃ. ৫
৪. নিজস্ব সংবাদাতা, বহরমপুর। 'অভিযোগ, বিয়ে বেআইনি লক আপে দুর্গা-গৌরব', আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০২, পৃ. ১
৫. চক্রবর্তী, কমল, ব্রহ্মভার্গব পুরাণ, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুযারী ২০১৭, পৃ. ৬১
৬. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত', দৈনিক অধিকার, odhikar.news, ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৯,১০:১৩. https://www.odhikar.news/literature/46125/সুভাস-মুখোপাধ্যায়ের-ফুল-ফুটুক-না-ফুটুক-আজ-বসন্ত, Dated 23 novenber 2022.
৭. চক্রবর্তী, মানব, সন্তাপ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৩, পৃ. ৭
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবী, বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে তৃতীয়সত্তা চিহ্ন, প্রতিভাস পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারী ২০১২, পৃ. ১৮২
৯. চক্রবর্তী, মানব, সন্তাপ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৩, পৃ. ৮২
১০. চক্রবর্তী, মানব, সন্তাপ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৩, পৃ. ২৪-২৫

ছবিঋণ :

Pothon pathon, Image: PART 7] WBBSE Class 10 Life Science Model Activity Task Part 6 Solutions 2021। দশম শ্রেণী জীবন বিজ্ঞান মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক পার্ট 7।
www.pothonpathon.online, September 25, 2021,
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://1.bp.blogspot.com/wlQo4e_GNw/YU9DkzpvubI/AAAAAAAABkU/pSrs4AOuTB0gWWhy2_CKz_e79BGy5kgCLcBGAsYHQ/w640h640/WBBSEclass10modelactivitytasklifescienceart7answerscheckerboarding&imgrefurl=https://www.pothonpathon.online/2021/09/wbbseclass10lifesciencemodelactivitytaskpartanswers.html&tbnid=oghS8fP2elJ4XM&vet=1&docid=N2hpMtolOF9nM&w=640&h=640&itg=1&hl=en-US&source=sh/x/im. Dated October 21, 2022